বড়ো দুর্ভাগা এই দেশ

শ্যামল দত্ত

বড়ো দুর্ভাগা এই দেশ, বড়ো দুর্ভাগা এই জাতি। ঘুরেফিরে পড়ে যায় একই চক্করে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে যায় বারবার। মানুষ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। গ্রেপ্তার হয়েছেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো দলের সভানেত্রী তিনি। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি এবং তার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, যিনি এই রাষ্ট্রের নির্মাতা এবং যার জন্য পেয়েছি আমরা এক টুকরো স্বাধীন ভূখণ্ড, একটি মানচিত্র ও একটি পতাকা।

ভোররাতে শেখ হাসিনার বাসায় এ দেশেরই বাহিনী গিয়ে গ্রেপ্তার করেছেন তাকে। গ্রেপ্তার হতেই পারেন। রাজনীতিবিদরা গ্রেপ্তার হন, কারণে-অকারণে। এবারের গ্রেপ্তার দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু কিছু প্রশ্ন, নানা প্রশ্ন মানুষের মনে। কতোটুকু অনিবার্য ছিল এই গ্রেপ্তার। প্রশ্ন আরো নানা বিষয় নিয়ে ঘুরছে ফিরছে নানা মহলে, নানা জায়গায়। কী হতে যাচ্ছে? নতুন কিছুর প্রত্যাশায় যারা ছিল, তাদের মধ্যেও এখন হতাশা। ইতিহাস থেকে আমরা কোনো শিক্ষাই নেবো না? ঘুরেফিরে চক্কর খেতেই থাকবো?

দেশের অনেক মানুষের গত সোমবার বৃষ্টিস্নাত সকালে ঘুম ভেঙেছে শেখ হাসিনার গ্রেপ্তারের খবর শুনতে শুনতে। ঠিক একমাস পরেই ১৫ আগস্ট। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এরকম বৃষ্টিস্নাত ভোররাতে ৩২ নম্বরে ঢুকেছিল একদল সশস্ত্র সৈনিক, যাদের হাতে জীবন দিয়েছিলেন সপরিবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ হাসিনা নিজেও জীবনে প্রথমবারের মতো কারাভোগ করলেন সেরকম একটি সকালে।

আইন এমনই এক জিনিস– বড়ো বিচিত্রই এর গতি। আইন মানুষকে বিচার পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। আবার এই আইনের কারণেই বিচারবঞ্চিত লাখো মানুষ। আইনের হাত কাউকে দ্র"ত স্পর্শ করে। আবার কোনো কোনো জায়গায় আইন কখনোই পৌঁছায় না। অনেকেই বলেন আইনের হাত লম্বা, তবে অতো লম্বা না যে তার প্রমাণও আছে। এই আইনের কারণে গ্রেপ্তার হয়েছেন শেখ হাসিনা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রায় ৩ কোটি টাকা ঘুষ নিয়েছেন। ঘুষ নেওয়াটা অপরাধ। ঘুষ দেওয়াটা অপরাধ কিনা তা আইনবিদরাই বলতে পারবেন। কিন্তু শেখ হাসিনাকে যখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হলো আদালতে, বাদীর কিন্তু দেখা নেই। বাদীর আইনজীবীও নেই। সরকারি উকিলই ভরসা। যে কোনো একটি রাজনৈতিক সরকারের আমলে রাজনীতিপুষ্ট নিম্ন আদালত যেভাবে আচরণ করে, অরাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও ঘটছে তাইই। এই দেশে আমরা

কি আদৌ একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা পাওয়ার যোগ্য? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর কারো কাছে আছে কিনা আমার জানা নেই।

শেখ হাসিনা চাঁদা নিয়েছেন কি নেননি সেই বিচারের ভার আমরা আদালতের ওপর ছেড়ে দিলাম। তবে বিচারের আগেই কাউকে শাস্তি পেতে হবে– এটা কেমন বিচার? একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় পুরো বিচারের কাজটি শেষ করে শেখ হাসিনা যদি অপরাধী প্রমাণিত হন– তাহলে শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার নিয়ে প্রশ্ন উঠতো না। এখন প্রশ্ন উঠছে এবং ওঠাটাই স্বাভাবিক। অনেকেই ভাবছেন– এই গ্রেপ্তারের পেছনে শুধুমাত্র দুর্নীতির বিচার নয় ভিন্ন কোনো কারণ আছে।

শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার সর্বশেষ দেখা হয় বঙ্গভবনে গত ১২ জানুয়ারি। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ সেদিনই শপথ নিলেন নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসেবে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে পাশের একটি ছোট ঘরে চা খাওয়ার আয়োজন। হাসিনা, ফখরুদ্দীন ও ইয়াজউদ্দিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন অতিথিদের সঙ্গে। আমি চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে প্রথমেই ড. ফখরুদ্দীনকে শুভেচ্ছা জানালাম এবং তাকে অনুরোধ করলাম টেলিভিশনে খবর প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য। শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করলাম বিষয়টি নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনি বললেন, বঙ্গভবন ছাড়ার আগেই তিনি ড. ফখরুদ্দীনকে অনুরোধ করবেন। কিন্তু বঙ্গভবন ছাড়ার আগেই আমি খবর পেলাম যে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। তখনই মনে হলো অনেক কিছুই নানা জায়গা থেকে ঘটছে– যা হয়তো ড. ফখরুদ্দীনেরও জানা নেই। সেদিন বঙ্গভবনে অনুপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ছিলেন খুবই উৎফুল। তারা তখনো বুঝতে পারেননি তাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। কিন্তু ১১ জানুয়ারির ঘটনা পরম্পরা যারা জানেন, তারা আশঙ্কা করছিলেন ভিন্ন কিছু।

বড়ো আশা নিয়ে একটি জর"রি অবস্থাকেও স্বাগত জানিয়েছিল এদেশের মানুষ। কারণ রাজনৈতিক দলগুলোর গোঁয়ার্তুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল জনগণ। একদল নির্বাচন করবেই, অন্যদল যেকোনো মূল্যে নির্বাচন ঠেকাবে। বলির পাঁঠা জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ১১ জানুয়ারির পর। প্রত্যাশা ছিল নতুন একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে দ্রুত একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারবে। কিন্তু দীর্ঘ ৬ মাস পর অভিযোগ উঠছে অপ্রয়োজনীয় বিলম্বের। প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ প্রথম জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, দ্র"ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করবেন। সেই দ্রুত ব্যবস্থা যে ২ বছর তা কেউ ভাবেনি। তিনি বললেন, ২০০৮-এর মধ্যেই নির্বাচন হবে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ বললেন ২০০৮-এর মধ্যে নির্বাচন হবে এবং সর্বশেষ রোডম্যাপ ঘোষণার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদাও বলেন আগামী বছরের ডিসেম্বরে নির্বাচন। মানুষের প্রত্যাশা ছিল একটি শক্তিশালী স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। বিচারপতি আজিজ নির্বাচন কমিশনের যে চেহারা বানিয়ে রেখেছিলেন– তার পরিবর্তন দেখতে চায় মানুষ। কিন্তু শঙ্কা তৈরি হচ্ছে মানুষের মনে। ঘরোয়া রাজনীতি উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনকে সরকারের উপদেষ্টাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে– এ কেমন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন?

রাজনীতির যে কদর্য চিত্র ছিল গত কয়েক দশকে, তা থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সংস্কারের পক্ষেই দেশের অধিকাংশ মানুষ। যিনি রাজনীতির অ আ ক খ বোঝেন না– তাকে জিজ্ঞেস করলেও বলবেন– এই রাজনীতি চলতে পারে না। কিন্তু সংস্কার কী এভাবে হয়। জোর করে কাউকে পেনে উঠতে না দিয়ে আর কাউকে পেনে জোর করে তুলে দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংস্কার আনা যাবে? সরকারের কাণ্ডকারখানা দেখে, যারা সত্যিই দেশের সর্বস্তরে একটি অর্থবহ ইতিবাচক পরিবর্তন চান তারা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে অন্তত সেরকমই মনে হয়। কারো কারো আশঙ্কা সংস্কারের উদ্যোগটি কি ভণ্ডুল হতে চলেছে? আমাদের সামনে সংস্কারের এরকম দ্বিতীয় কোনো সুযোগ কি আর আসবে? শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের খবরে উৎফুল হয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মিষ্টি বিতরণ করেছে একটি পক্ষ। পুলিশ প্রহরায় ঢাকায় আনন্দ মিছিল করেছে জাগ্রত জনতা নামের একটি সংগঠন। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুর লাশ যখন ৩২ নম্বরের সিঁড়িতে পড়ে ছিল, তখনো মিষ্টি বিতরণ করেছিল কোনো কোনো গোষ্ঠী। আনন্দ মিছিল করানোর চেষ্টাও

হয়েছিল। এ ধরনের রাজনীতি যারা করে– তারা ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত হয়। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো আমরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিই না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অনেক উপদেষ্টাই বলছেন– আইনের চোখে সবাই সমান। হাসিনার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ মিছিলে লাঠিচার্জ ও গুলি। অন্যদিকে আনন্দ মিছিলে পুলিশ প্রহরা– আইনের চোখ সমান হওয়ার নজির কি এটা? গোপালগঞ্জে গতকাল কার্যত হরতাল পালিত হলো। দোকানপাট খোলেনি, স্কুল-কলেজ বন্ধ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সম্ভবত এটাই প্রথম হরতাল। আমরা কি আবার হরতাল যুগে প্রবেশ করছি। এর থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই। বড়োই দুর্ভাগা এদেশের মানুষ।

মানুষ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ চায়, পরিশীলিত রাজনীতি চায়। এবং সেটা চায় একটি স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে। অস্বাভাবিক একটি অবস্থা দেশের জন্য কোনোভাবেই মঙ্গলজনক নয়। জর''রি অবস্থা একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। সংস্কারের মধ্য দিয়ে একটি নতুন রাজনীতি মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করবে– এমন প্রত্যাশাই সকলের। একটি অবরুদ্ধ সমাজে কোনো কিছুই বিকশিত হয় না– না অর্থনীতি না সংস্কৃতি। দ্রব্যমূল্য যে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না– এটা তার একটি বড়ো কারণ। দেশের মানুষের প্রত্যাশা দ্রুততম সময়ে একটি গ্রহণযোগ্য, স্বচ্ছ, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা যার মধ্য দিয়ে আমরা সুস্থ রাজনৈতিক ধারায় ফিরতে পারবো। কারণ আমরা গণতন্ত্রের কথা বলবো আর দীর্ঘদিন অনির্বাচিত সরকারের অধীনে থাকবো– এ দুটো একসঙ্গে কখনোই হয় না।

১৮ জুলাই

শ্যামল দত্ত ঃ সম্পাদক ভোরের কাগজ